মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের ৮১তম জন্ম বার্ষিকীতে প্রগ্রেসিভ ফোরাম আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ:

.....

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা ও সংগঠক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের ৮১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের সেমিনারের মাননীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি অগ্নিযুগের ত্যাগী নেতা শ্রী অজয় রায়, প্রবীন সাংবাদিক জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, প্রফেসর ডঃ আব্দুল মোমেন, শহীদ তাজউদ্দীন সাহেবের সুযোগ্যা কন্যা ও বিশিষ্ট লেখিকা শারমিন আহমদ, উপস্থিত সুধী , সাংবাদিকভাই ও বোনেরা-

প্রবাসে প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন গুলোকে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। তারই অংশ আজকের এই ক্ষুদ্র আয়োজন।

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে, বোস্টন ও অন্যান্য দুরের স্টেট থেকে কষ্ট স্বীকার করে যারা এখানে এসে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন প্রথমেই তাদের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

ব্যতিক্রমী এক মানুষ ছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। অসম্ভব রকম মেধাবী ছিলেন ছাত্রজীবন থেকে। ক্লাশে বরাবর প্রথম হতেন। ষষ্ট শ্রেণীর স্কলারশীপ পরীক্ষায় তিনি সমগ্র ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মেট্রিক ও ইন্টামিডিয়েট পরীক্ষায় ১২তম ও চতুর্থ স্থান লাভ করেন। পবিত্র কোরআন এ হাফেজ ছিলেন। শান্ত, ধীরস্থির, অন্তর্মুখীন তাজউদ্দিন মঞ্চে উঠে জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার চাইতে কর্মীসভায় আলাপ আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। প্রজ্ঞা, মেধা ও যুক্তিবাদীতায় হয়ে উঠতেন সকলের মধ্যমণি। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে তাঁর সামান্যতম অংহকারবোধ ছিলনা। বঙ্গবন্ধুর হয়ে আওয়ামী লীগের হয়ে, বাঙালী জাতির হয়ে বাংলাদেশের সরকারের হয়ে যেকোন বক্তব্য উপস্থাপন, বক্তব্য লিখে দেয়া, প্রস্তাব লেখা, দরখাস্ত বা স্মারকলিপি লেখা, নীতি ও আদর্শের বক্তব্য লেখার জন্য সকল নেতারাই নিশ্চিন্তে নির্ভর করতেন জনাব তাজউদ্দীনের উপর। তাঁর মত জ্ঞানী, সৎ ও জনদরদী মানুষ সমাজে বিরল। তিনি কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি। অন্যায়-অযৌক্তিক কোন আবদার বা দেন দরবার নিয়ে তাঁর কাছে যেতে কেউ সাহস করতনা। প্রখর দুরদৃষ্টি ও সুক্ষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, নীতি ও আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ, কর্মঠ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন-নির্ভরযোগ্য ঘনিষ্ট বন্ধু।

২৫শে মার্চ রাতে যারা ৩২ নম্বরে এসেছিলেন তাদের বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, " আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি গোছগাছ মতই আছি। তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যরা এসেছিল, চলে গেছে। আপনি যান, কি করবেন না করবেন তাজউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।"

জনাব তাজউদ্দীনের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই কথাটিই ছিল "তাঁর নেতা ও অগ্রজের আমানত।" ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় পর্যন্ত এমনকি পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নেতা ও অগ্রজের আমানতকে তিনি সর্বান্তকরণে রক্ষা করেছিলেন। " তুমি পারবে" বঙ্গবন্ধুর এই আস্থাকে চরম ধৈর্য্য-সহ্য ও বিশ্বস্ততার সাথে তিনি সত্যে পরিণত করেছিলেন।

মহাভারতে আছে রামের খড়ম সিংহাসনে রেখে ভরত রামের পক্ষে দেশ শাসন করেছিলেন। এটা একটা পৌরাণিক কাহিনী কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা বাস্তব হয়েছে তাজউদ্দীনের ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধুর নামেই জনাব তাজউদ্দীন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালন 1 করেন। ইতিহাসে যেকোন জাতি তার লক্ষ্য-আদর্শ ও স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হলে তার শ্রেষ্ট সন্তানরা সেই মহতী লক্ষ্য বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়। তাদেরকে শারিরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করলে সাময়িকভাবে সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু একই লক্ষ্য নিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংগ্রামকে অগ্রসর করে নিতে পারে।

পাকিস্তানের শোষন-বঞ্চনা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালী জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভ করলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করেছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভূট্টো ও সামরিক শাসকদের একটি চক্র বাঙালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আলাপ আলোচনার নামে এদেশে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র এনে জড়ো করে। আলোচনার সাফল্য বা ব্যর্থতা কিছুই ঘোষণা না করে বঙ্গবন্ধুকে না জানিয়ে তারা পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে। ২৫শে মার্চ রাতে তারা সমগ্র ঢাকায় ও দেশের অন্যান্য স্থানে ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র জনগনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডী ৩২ নম্বর রোডের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও সরে যেতে বা পালাতে অস্বীকার করেন। "এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নিজ জীবনকে নিয়ে ঝুঁকি নিচ্ছেন এভেবে যে, আমাকে যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে এটা নিয়ে আন্দোলন হবে এবং সারা দেশে এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, তাতে স্বাধীনতা আসবে। অথবা আমাকে যদি ওরা হত্যা করে ফেলে তাতেও এমন আগুন জ্বলবে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় ভাবেই আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য পরিপূর্ণ হবে।"

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাতে জীবন বাজি রেখে নিজ গৃহে অবস্থানের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে তাঁর পক্ষে বাংলার মুক্তি সংগ্রামের সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য বেছে নিলেন এমন একজনকে যাঁর উপর তিনি নির্ভর করেছেন আওয়ামী লীগ গঠনের সময় থেকে। ৬ দফা প্রণয়নে, গোলটেবিলের বক্তব্য তৈরীতে, নির্বাচনী ইশতেহার রচনায় অসহযোগের নীতিমালা প্রণয়নে তিনিই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত। জাতির সামনে মহা দুর্যোগের মুহূর্তে পরম নির্ভর বন্ধুর হাত ধরে বললেন " তুমি সরে পড় তুমি পারবে।" তিনি আর কেউ নন, বাংলার আরেক অবিসংবাদিত নেতা তাজউদ্দীন আহমদ। নেতার নির্দেশে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও দেশপ্রেমের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত করেছিলেন জনাব তাজউদ্দীন আহমদ। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন সব সময় বলতেন " আমি যে দায়িত্বে অর্পিত হয়েছি" বা "আমার উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে।" তিনি বলতেন, "আমি একটা নিমিত্তমাত্র। " এটা ছিল তাঁর মনোভাব, এটা মুজিব ভাইয়ের কাজ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।

৭১ এর মার্চের চরম দুর্যোগের মধ্যেও তিনি ছিলেন গভীর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন রাষ্টনায়কের মত। আত্মপরিচয় গোপন করে তিনি ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করেননি। তিনি বলেন, "আমরা সীমান্ত অতিক্রম করব স্বাধীন দেশের সরকারের মুখপাত্র হিসেবে। একটি স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিদেরকে যেভাবে সম্মান দিয়ে গ্রহণ করতে হয় সেভাবে তারা আমাদের গ্রহণ করতে রাজী আছে কিনা জানালে আমরা (ইন্ডিয়ার) ভিতরে যাব।" "সন্ধ্যার অনেক পর (সীমান্তের ওপারে) ঝোঁপের ভিতর থেকে ভারি বুটের শব্দ ভেসে এল। ওরা এসে আমাদেরকে অভিনন্দন করল। ঠিক যেভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সম্মানিত অতিথিকে গার্ড অব অনার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আমাদেরকেও সেইভাবে আমন্ত্রন জানানো হলো। " বিশেষ বিমানে তাঁকে কলকাতা থেকে দিল্লী নেয়া হল। ৪ঠা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে এসে তাজউদ্দীন সাহেবকে রিসিভ করলেন ও জিজ্ঞেস করেন শেখ মুজিব কেমন আছেন? ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনায় জনাব তাজউদ্দীন খুব স্পষ্ট করে বললেন " এটা আমাদের যুদ্ধ। আমরা চাই ভারত এতে জড়িত হবে না। আমরা চাইনা ভারত তার সৈন্য দিয়ে অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্বাধীন করে দিক। এই স্বাধীনতার লড়াই এটা আমাদের নিজেদের এবং আমরা এটা নিজেরাই করতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের যা দরকার হবে তা হচ্ছে, আমাদের মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য আপনাদের দেশের আশ্রয়, ট্রেনিং এর সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা এবং সে ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং অস্ত্র সরবরাহ এসব আমাদের জরুরী প্রয়োজন হবে। এবং আমরা যেরকম পরিস্থিতি দেশে দেখে এসেছি তাতে মনে হয় যে দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রচুর শারণার্থী এদেশে ঠাঁই নেবে। তাদের আশ্রয়, আহারের ব্যবস্থা ভারত সরকারকে করতে হবে। বর্হিবিশ্বে আমাদের স্বাধীনতার কথা প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কূঠনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখবেন এটা আমরা আশা করি। ... এই যুদ্ধকে যেন হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের লড়াই হিসাবে কেউ না দেখায় কিংবা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন লড়াই হিসেবে কেউ না দেখায় যা পাকিস্তানের প্রচেষ্টা হবে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুই শুধু তাজউদ্দীনের উপর নির্ভর করেননি তাঁর চারিত্রিক গুনাবলীর কারণে দিল্লীর একটা বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। ফলে জনাব তাজউদ্দীনের উপর দিল্লী নির্ভর করত। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান কে জি রুস্তমজী বলেন, তাজউদ্দীন ও তাঁর সংগ্রাম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মিসেস গান্ধীর সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। আমি প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি যে, জনাব তাজউদ্দীনের উপর মিসেস গান্ধীর ছিল গভীর বিশ্বাস।

ডিসেম্বর '৭১ এর প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। ভারতের সরাসরি যুদ্ধে জড়িত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই সময় তাজউদ্দীন ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন যে, " বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য ঢুকবার আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কিভাবে সৈন্য ঢুকবে তার একটা ভিত্তি তৈরী করতে হবে। সেই ভিত্তি ছাড়া বাংলাদেশে ঢোকা যাবেনা। তখন ভারতের সাথে চুক্তি হয় যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে তারপর ভারতের সৈন্য বাংলাদেশে ঢুকবে এবং যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে ঢুকবে। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ভারতকে সব সময় আমাদের সাথে আমাদের কমান্ডের সাথে একত্রিত থাকতে হবে এবং যখনই বাংলাদেশ সরকার বলবে তখরই ভারতের সৈন্যদের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। মিত্রবাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ফ্রান্সে ঢুকেছিল তখনতো এই রকম চুক্তি করে তারা ঢুকেনি। এমনকি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অতীতে বন্যায়, জলোচ্ছাসের সময় যে আমেরিকান টাস্ক ফোর্স বাংলাদেশে ঢুকল তারা তো কোন চুক্তি ছাড়াই ঢুকেছিল। অথচ ভারতীয় সৈন্য ঢোকার আগেই তাজউদ্দীন এই চুক্তি করেছিলেন। এই চুক্তির বলেই

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়ার অনুরোধ জানান। এর চেয়ে ভাল এবং মহৎ এবং এত সুন্দর চুক্তি তো পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখি (ব্যাস্টার আমিরুল ইসলাম)।

যখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন ঢাকায় সেই সময় বিএসএফ এর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার গোলক মজুমদার ও বিএএসএফ এর মহাপরিচালক রস্তমজী উপস্থিত ছিলেন দম দম বিমান বন্দরে। বিদায় জানাতে গিয়ে রস্তমজী বলেন, "আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। তখন জনাব তাজউদ্দীন বললেন " অবশ্যই দুটি স্বাধীন দেশের মর্যাদার ভিত্তিতে আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষন্ন থাকবে।

ভারত সম্পর্কে জনাব তাজউদ্দীনের বক্তব্য ছিল " আমরা যখন চরম সংকটের সম্মুখীন তখন যখন কেউ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন ভারতই আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। পাকিস্তানীরা যখন পথের কুকুরে মত মারছিল তখন ভারতই আমাদের একটা নিরাপদ স্থান দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভারত সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়েছিল। এই ঝুকিটা শুধু যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তা নয়, তৎকালীন যে মহাশক্তি আমেরিকা তার বিরুদ্ধেও। তখন ভারত আমাদের পক্ষ হয়ে রুখে দাড়িয়েছিল। এই কথাটাতো আমি কোনদিন ভুলতে পারবনা। কারণ এটা যদি ভুলি তাহলে আমি অকৃতজ্ঞতার দোষে দোষী হব। তার অর্থ এই নয় যে ভারতের নীতি আমাদের দেশের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কিংবা স্বার্থের পরিপন্থী হলেও আমরা সেটা নির্বিচারে মেনে নেব। আমরা কোন দিনই জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কাজ হতে দেবনা।

পরবর্তীকালে জনাব তাজউদ্দীন যখন বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তখনো তিনি ভারতের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে লড়াই করেছেন। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়াম্যান প্রফেসর নুরুল ইসলাম লিখেছেন " আমরা একবার ভারতে গেলাম একটা ডেলিগেশন নিয়ে। আর এদিকে এনায়েতউল্লা খান হলিডেতে হেডলাইন দিয়ে লিখে ফেললেন, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন গেছে ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে আসতে এবং প্ল্যান তৈরী করার আগে দিক নির্দেশনা নিতে। এই কথাগুলো ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জঘন্য অপপ্রচার। আমাদের মনোভাব ছিল, আমরা স্বাধীন দেশ, কথাবার্তায় আলোচনায় আমরা স্বাধীনতার কথা বলব। দেশের স্বার্থের বিষয়ে কোন খাতির নেই। যেমন পাট নিয়ে আলোচনার সময় আমরা সরাসরি ভারতকে বলেছি, তোমাদের পাট উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। তোমাদের খরচ বেশি, তোমরা কেন পাট উৎপাদন করছ? আমরা তোমাদের কাছে পাট বিক্রি করব। জনাব তাজউদ্দীনের কথা ছিল, বিপদে সাহয্য করেছ ভাল কথা, আমরা বন্ধু থাকব কিন্তু তাই বলে আমার দেশের স্বার্থের ক্ষতি হয় এমন কোন সুবিধা আমি তোমাকে দেবনা।

দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতা জনাব তাজউদ্দীনের দৃষ্টিতে "মুক্তিযুদ্ধ একটা প্রক্রিয়া, চলমান প্রক্রিয়া যা ১৬ই ডিসেম্বর শেষ হয়ে যায়নি। দেশে সত্যিকার ন্যায় বিচার, সমাজে সুষম বন্টন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে যে সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেই সুযোগ আর পাওয়া যায়নি।

জনাব তাজউদ্দীন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই মানুষের দুঃখকষ্টের অবসান হয়না। এজন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া নির্ভর করে নির্ভুল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী মালিকরা সব শিল্প কারখানা পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে চলে যায়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ জাতীয়করণ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে আসে প্রায় চার পঞ্চমাংশ পুঁজি। এর মধ্যে পুরো রেল ব্যবস্থা, বিমান ব্যবস্থা, নৌ চলাচল ব্যবস্থা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনার নয় দশমাংশ। তখন অর্থনীতি পুর্নগঠন ও বিকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নতুনভাবে অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির আওতায় রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানার কাজ করতে পারে এক রকম কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন। বিদেশী এক সাংবাদিকের সাথে আলোচনায় তিনি বলেন " আমাদের গড়ে সাতকোটি মানুষের মধ্যে ভূমিহীন ও পাঁচ একরের কম জমি আছে এমন কৃষকই হলো ৭৮ শতাংশ। প্রায় (দুই) কোটি মানুষ পরিবার পরিজনসহ একেবারেই নিঃস্ব, আরও ৩ (তিন) কোটি কৃষক কি করে দিন চালাবে তা জানেনা। দুই পঞ্চমাংশ কৃষকের হালের বলদ নেই। এই দুই ক্যাটাগরির মানুষ স্থানীয় ধনী কৃষকদের জমিতে কাজ করে। ফসলের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশই তারা জমির মালিককে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের কৃষিভূমি দেশের মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারেনা। প্রতিবছর ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়। আমদানী করতে হয় ১১০ থেকে ১১৫ লক্ষ টন চাল। শোষন ও যুদ্ধের ফলে কৃষির অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনায় আমরা চাইছি কৃষকদের অবস্থা ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে এবং কৃষিজ উৎপাদন এমন পর্যায়ে বাড়াতে, যখন তা আমাদের চাহিদা মেটাতে পারবে। কি দিয়ে শুরু করব? একবারেই তো আড়ষ্ট কঠিন সমস্যায় সামাধান সম্ভব নয়, এজন্য দরকার দীর্ঘ সময়। প্রথমে আমাদের সবচেয়ে কঠিন কাজটি করতে হবে। ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কৃষি

সংস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী ও সন্তানসহ কোন পরিবারের ১০০ বিঘার বেশি জমি থাকতে পারবেনা। ক্ষুদ্র চাষির কাছ থেকে কর আদায় করা হবেনা। আমরা এখানেই থামবনা। শ্রমনীতি ও কৃষকদের ঋন দেওয়ার ব্যবস্থা করব, সার, চাষের বদল, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেব। আপনাদের সোভিয়েত ট্রাক্টর গুলো ভালোই কাজ করছে। আমরা আইলের পর আইল দিয়ে জমি নষ্ট করতে দিতে পারি না। রাষ্ট্রিক বিবেচনায় আইলে ভাগ করা ২ বিঘা জমিতে চাষ করা যৌক্তিক নয়। তাই আমাদের অন্য কোন পথ খুঁজে বের করতে হবে।

আদর্শবাদী হলেও জনাব তাজউদ্দীন ছিলেন বাস্তববাদী। পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে দ্বিধা করেননি। জাতীয়কৃত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে কাজ করছেন এমন একজন যিনি আগে ব্যক্তি মালিকের হয়ে কাজ করতেন, আমাদের জাতীয়করনের কাজকে তিনি ন্যায়সঙ্গত কাজ বলে মনে করতেন না এবং আমাদের সাফল্য আসবে এটা বিশ্বাসও করতেন না। কিন্তু তারা তাদের কাজটা ভালো বোঝেন, অভিজ্ঞ লোক, বর্তমানে তাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

স্বাধীনতার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে যুদ্ধের সময়ে ডুবে যাওয়া জাহাজগুলো পানির ভিতর থেকে তুলে দিয়ে বন্দরকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করেছিল। দেশত্যাগ করে যাওয়া ২ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারকে ভারত সরকার বাড়ি তৈরী করে দিয়ে পূণর্বাসন সাহায্য করেছিল। এমনিভাবে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো এবং অর্থনীতি পুনর্গঠনে বিশ্বের অনেক দেশ সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে। তখন আমেরিকার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জন্য শর্তসাপেক্ষে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে একজন প্রতিনিধি জনাব তাজউদ্দিনের সাথে দেখা করেন। তখন তিনি স্পষ্টভাবে তাকে বলেছিলেন, ভিক্ষুকদের বেচে নেয়ার বা পছন্দ করার কোন সুযোগ থাকেনা। কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মানুষ, যারা রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমরা তো ভিক্ষক নই। তাই কোন শর্ত সাপেক্ষ কারো সাহায্য নিতে আমরা ইচ্ছুক নই। এধরণের দৃঢ় মনোবল বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোন রাষ্ট্র নায়কের ক্ষেত্রে আজও লক্ষ্য করা যায়নি।

স্বাধীনতার পর ৭২ এর জানুয়ারীতে সরকারী কোষাগার ছিল ফাঁকা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূণ্য কিন্তু '৭২ এর সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ৯ মাসের মধ্যেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়াল শূন্য থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলারে। আন্তর্জাতিক বাজার অনুযায়ী এই রিজার্ভ ছিল সন্তোষ জনক। এই অবস্থায় আই এম এফের (TMF) ঋন নেব কিনা প্রশ্ন উঠলো বাস্তববাদী তাজউদ্দীন ঘোষণা করলেন, সম্পূর্ণ শর্তহীন ভাবে হলে এই ঋন আমরা নেব"।

স্বাধীনতার ৩৫ বছর পর আজ যখন বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের কৌশল পত্র তৈরী করার আমাদের দক্ষ কোন কর্মী নেই, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দেশে এলে বিনিয়োগের শর্তগুলো দেশের স্বার্থের অনুকুলে তৈরী করার মত যোগ্য লোক নেই... যোগ্যতা দিয়ে বিশ্লেষণ দিয়ে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে ওদের পেপারের বিপরীতে আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা করে পেপার তৈরীর কেউ নেই, দেশের অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের ক্ষমতা উন্নয়ন ও শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক ইউনিট গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া, বিদেশে পাঠানো, বিদেশে থেকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ট মেধাবী সন্তানদের দেশের কাজে আগ্রহী করার কোন উদ্যোগ আগ্রহ কোন সরকারের নেই। আমেরিকা, ভারত, বিশ্বব্যাংক আমাদের নিয়ন্ত্রন করছে বলে যখন কথা ওঠে, তখন মনে পড়ে অর্থমন্ত্রী হিসেবে জনাব তাজউদ্দীন পরিকল্পিতভাবে দেশের কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন স্টেটিসটিক্যাল (statistical) বুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্ল্যানিং সেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দেশের অর্থনীতি পরিচালনার জন্য, প্রশাসনের জন্য, নীতি নির্ধারনের জন্য, বাস্তবায়নের জন্য যে ইন্সটিটিউশনগুলো (Institution) দরকার সেগুলো শক্তিশালী না করে, আমরা যদি নিজেদের সমস্যা ও তার সমাধান নিজেরা কিছু বের না করে সব সময় চিৎকার করি বিদেশীরা সব করে ফেললো, অভিযোগ করি ওরা আমাদের ওপর সব চাপিয়ে দিচ্ছে, তাহলে কি লাভ হবে? বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশ্লেষনের ক্ষমতা উন্নয়ন ও শক্তিশালী করার আগ্রহ কোথায়? তাই আজ দেশকে স্বাধীন স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে উন্নয়নের সুফল কিছু কালো টাকার মালিকও রাজনীতি বিদেশের জন্য নয়, দেশের কৃষক শ্রমিক জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণের কথা আসে তখন তাজউদ্দীনের মত একজন অর্থমন্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্দি করি। প্রাজ্ঞ ও দুরদর্শী নেতা হিসেবে জনাব তাজউদ্দীন ছিলেন সফল, দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে বিজয়ী হয়। যুদ্ধের সময়ে "মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হত ইয়থ ক্যাম্পের মাধ্যমে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল থেকে তাদের নেয়া হত। যে যুবকটি এদেশের জন্য যুদ্ধ করতে চায় তাকে সাহায্য করা উচিত যাতে সে যুদ্ধ করতে পারে। এটাতো ব্যক্তিগত যুদ্ধ নয়, দলীয় যুদ্ধও নয়। এটা জাতীয় যুদ্ধ। আমি যে মতেই বিশ্বাস করিনা কেন আমার যুদ্ধ করবার অধিকার আছে এবং যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার যে প্রস্তুতি দরকার সে প্রস্তুতি পাবারও অধিকার আমার আছে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে বোঝানোর পর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ মত দিয়েছিলেন যে, অন্যান্য দল থেকেও ট্রেনিং দেয়ার জন্য ছাত্র-যুবক নেয়া হবে। এটা অনুমোদন করতে গিয়ে তিনি বেশ প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিলেন।

তিনি বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনাব তাজউদ্দীন ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুজিব নগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। এতে মওলানা ভাসানী, কমরেড মণিসিং, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবন্দ ছিলেন। এসব সংগঠনসহ ছাত্রইউনিয়নের কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণসহ অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। উপদেষ্টাদের কমরেড মণিসিং বিপ্লবী ইলা মিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে গমন করেন। বিশ্বশান্তি পরিষদ সম্মেলনে ন্যাপনেতা দেওয়ান মাহবুব আলী বুদাপেষ্টে অংশ গ্রহন করেন।

মুক্তিযদ্ধের সময়টিতে বিশ্ব দুই পরাশক্তির প্রভাবে বিভক্ত ছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরু থেকেই বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানী নির্যাতনকে নিন্দা করেছিল, বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছিল। জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের পক্ষে বলিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের বিরুদ্ধে ডিসেম্বরের শেষ মুহূর্তে সোভিয়েত নৌবহর পাঠিয়েছিল। কিন্তু প্রাজ্ঞ ও দুরদর্শী তাজউদ্দীন সোভিয়েতের এ অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে থাকেননি। সোভিয়েত বলয়ের বাহিরেও সারা বিশ্বের মানুষের সাহায্য সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর কুঠনৈতিক নানা পদক্ষেপের কারণে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে বাংলাদেশের পক্ষে। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশে দেশে বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও বরেণ্য ব্যক্তিরা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে ও মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে সোচ্চার হন ও সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেন।

"জনাব তাজউদ্দীন তাঁর সমস্ত কাজ কর্মে নিজেকে নৈব্যক্তিক এবং ন্যায় পরায়ণ অবস্থানে রেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত গুরুত্ব এইসব তিনি কখনও বিবেচনায় আসতে দিতেন না।

" তিনি ছিলেন তাঁদের একজন যারা গণতান্ত্রিকভাবে মতভেদ দূর করতে চান। নিজ আদর্শের জন্য শহীদ হতে প্রস্তুত এমন নির্মল চরিত্রের সৎ রাজনীতিবিদ।

" বঙ্গবন্ধুর প্রতি জনাব তাজউদ্দীনের ভালবাসাটি ছিল বড়ই খাঁটি। তাজউদ্দীন গভীরভাবে বিশ্বস্ত ছিলেন তাঁর প্রতি। বঙ্গবন্ধুর অকল্যান হবে ভেবে তাজউদ্দীন অনেক কিছুই সহ্য করেছেন। শেখ সাহেবের মনকে গুছিয়ে দিতেন যিনি তিনি তো তাজউদ্দীন। এই দু'জনের জন্যই আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি। আর এই দু'জনের দূরত্বটা তাঁদের জীবনের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিতো বটেই, এই দেশের জন্যও সেটা এক চরম ট্র্যাডেজি, অপূরণীয় ক্ষতি।

" বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের মধ্যে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণাম ছিল বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ট্র্যাডেজি। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকত হত যদি এই দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য, দূরত্ব বা বিচ্ছেদ না ঘটত। এদু'জন ছিলেন পারফেঠ কম্বিনেশন(Perfect combination)। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য দুজনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হল, তাজউদ্দীন সাহেব চলে গেলেন, দেশর সর্বনাশ আরম্ভ হল।

বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ট ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা অর্জন। তার নেতা তাজউদ্দীন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে নানা বাধা বিপত্তি ও অন্তর্কলহের মধ্যেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করেছিলেন।

চীন স্বাধীনতা পেলে মহান নেতা মাও সেতুং চৌএন লাইকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। ভারত স্বাধীন হলে মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী করেন। কিন্তু বাংলাদেশে তা হলোনা। চীন ভারত আজ বিশ্ব শক্তি। এমনকি মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর তাইওয়ানের মত ক্ষুদ্র দেশগুলিও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে।

জনাব তাজউদ্দীনের জন্মদিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর জীবন থেকে বাংলার ও বিশ্ব ইতিহাস থেকে অতীত থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহন করা। তাই আজ প্রশ্ন ১৯৭১ এ অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ট অর্জন। হাজার বছরে বাঙালী এই প্রথম বাঙালী বিশ্ব সভায় তার স্বাধীন সত্বার স্বীকৃতি পেল। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে তার প্রতিটি খুটি নাটি বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করে এমনকি গৃহযুদ্ধ হলে তা নিয়েও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থান সমূহকে চিরস্মরণীয় করে পাঠ্য বিষয়ে, ইতিহাস বইতে, স্টুরিষ্ট গাইডে অন্তর্ভূক্ত করে। এসব বিষয়ে গবেষণা করে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের ও সিভিল সমাজের সে উদ্যোগ কোথায়?

খন্দকার মোশতাকের মত যেসব মীরজাফর স্বাধীনতা যুদ্ধকে ধ্বংস করার জন্য, বিপথগামী করার জন্য, স্বাধীনতার শত্রদের সাথে হাত মিলিয়েছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের জন্য, স্বাধীনতার পর সঠিক তদন্ত ও বিচার হলো না কেন? যদি স্বাধীনতার পর অর্থাৎ যথাসময়ে তাদের বিচার হতো ও বিচারের রায়ে যথাযত ব্যবস্থা গ্রহন করা হতো তাহলে কি মীরজাফরের বংশধরেরা এত সহজে পরবর্তীকালে আরো ষড়যন্ত্র করার সুযোগ ও সাহস পেত?

মোশতাকসহ যেসব যুব নেতারা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সংগঠক জনাব তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ও স্বাধীনতার পরেও সক্রীয় ছিল, যারা বঙ্গবন্ধুর মনকে তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছিল তারা কি মোশতাকের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল?

মোশতাক ও তার সহযোগীরা সব সময় বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে রাখত্ পরিকল্পিত ভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করার জন্য একেকজন একেক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে অগ্রসর করত। এটা খুবই দুঃখজনক যে বঙ্গবন্ধুর মত মহান নেতাও এসব ষড়যন্ত্রকারীদের কান কথা শুনতেন, বিশ্বাস করে তাজউদ্দীনের মত পুরনো সহকর্মীদের দূরে ঠেলে দিলেন। এরাই পরে তাঁকে ও পরিবারের সব সদস্যদের হত্যা করেছে। মোশতাক যার সাথে সম্পর্ক রাখত বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করার জন্য সেই যুবনেতা শেখ মণিকেও সে বাচতে দেয়নি। জাতীয় চারনেতাকে জেলখানাতেও তারা বাঁচতে দেয়নি।

ত্যাগী নেতাদের দূরে ঠেলে দিয়ে এখনো নেতানেত্রীদের ঘিরে থাকে সুযোগ সন্ধানীরা, চক্রান্তকরীরা, বিদেশের চর ও দেশের শত্রুরা। এদের মাঝে ভবিষ্যত মীরজাফর মোশতাকরা যে লুকিয়ে নেই তার নিশ্চয়তা কি? নেতারা যেভাবে দল পরিচালনা করে তাতে কোথাও সামান্যতম গনতন্ত্র আছে ? দলের ভিতর যদি গনতান্ত্রিক পরিবেশ থাকতো, সামালোচনা-আত্মসমালোচনার ধারা চালু থাকত, সবাই মন খুলে বক্তব্য রাখতে পারতো ও নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারতো তাহলে কি খন্দকার মোশতাকদের মত কুচক্রীরা ও তার পেছনে মদদদাতা দেশী বিদেশী ষড়যন্তকারীরা কাজ করতে পারতো?

মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে তাজউদ্দিন মিলিশিয়া, পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী ও প্রজাতন্ত্রের কর্মী, আমলা ও প্রশাসনযন্ত্র গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই লক্ষ্য থেকে কেন সরে আসলো সরকার?

আওয়ামী লীগ এমনকি বি এনপি ও যদি স্বাধীনতাকে সত্যিই স্বীকৃতি দেয়, ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তকে সম্মান করে তাহলে সেই যুদ্ধের প্রধান সংগঠক ও নেতা জনাব তাজউদ্দীনকে স্মরণ করেনা কেন? বীরের সম্মান এই জাতি না দিলে কি ভবিষ্যতে বীরের জন্ম হবে?

এখানে জনাব তাজউদ্দীনের ঘনিষ্ট ও পরিচিত অনেকেই আছেন। আমরা তাদের কাছ থেকে শুনব। আমার বক্তব্য ধৈয্য ধরে শোনার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। জয়বাংলা।

আলীম উদ্দিন
সদস্য সচীব,
প্রগ্রেসিভ ফোরাম, ইউএসএ।
৮/৬/০৬